প্রবন্ধ ২

গুরুপূর্ণিমা মানে বর্ষা হল শুরু

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম থেকেই গুরুপূর্ণিমার ধারণাটা এসেছে। বর্ষার একেবারে গোড়ায় গুরুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শিক্ষা বা ধর্মনিষ্ঠার পর্ব শুরু হত, আর এই অসুবিধেজনক ঋতুতে সন্ন্যাসীদের জনপদ থেকে সরিয়ে নেওয়াও যেত।

জহর সরকার

১৯ জুলাই, ২০১৬, ০০:০০:০৭

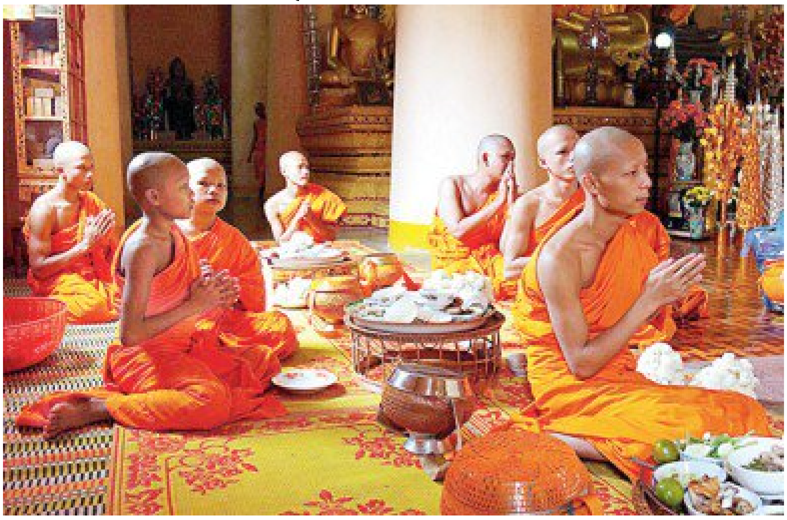

শুরু হচ্ছে ‘খাও ফানসা’। এর পর বর্ষার তিন মাস মঠ ছাড়বেন না ভিক্ষুরা। লাও, ২৪ জুলাই, ২০০২

গুরুরা যদিও প্রাচীন হিন্দুধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তবু তাঁদের সম্মানে আষাঢ় মাসে একটি পূর্ণিমা উদ্‌যাপন করার ব্যাপারটা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অবদান। ছাত্রদের শৈশব ও কৈশোর (মানে, ব্রহ্মচর্যের গোটা পর্যায়টা) জুড়েই গুরুদের আশ্রম বা পাঠশালাগুলি আবাসিক বা অনাবাসিক পড়াশোনার জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হত, কিন্তু বছরের ঠিক কখন পড়াশোনাটা শুরু হত, তা নিয়ে কেউই একমত নন। যে গুরুরা নির্দিষ্ট কোনও কৌশল শেখাতেন, ধরা যাক অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, তাঁরা তাঁদের শিক্ষাবর্ষ বা সিমেস্টার কোনও নির্দিষ্ট সময়ে শুরু করতেন না, আর আধ্যাত্মিক গুরুরা বোধহয় এ সব ব্যাপারে বেশ ঢিলেঢালা ছিলেন (এখনও আছেন)। বৌদ্ধরা কিন্তু এ ব্যাপারে পরিষ্কার: গুরুপূর্ণিমা হবে বর্ষার (পালি ভাষায় ‘বসসা’) একেবারে গোড়ায়, যখন নবীন-প্রবীণ সমস্ত শ্রমণকে জনপদ ছেড়ে পাহাড়ের গুহায় বা মঠে গিয়ে জড়ো হতে হবে ও তাঁদের সে বছরের শিক্ষা শুরু হবে। সন্ন্যাসী নয়, এমন মানুষও উৎসাহী হলে কিছু বিষয়ে পাঠ নিতে পারতেন, যেমন শাস্ত্র, ধর্মতত্ব, ভেষজ চিকিৎসা।

বর্ষাবাস নামে পরিচিত এই পূর্ণিমার দিনটিতে সারা ভারতে বর্ষা শুরু হত, যদিও উপকূলবর্তী অংশগুলো অন্য অঞ্চলের আগেই বৃষ্টি পেয়ে যেত। এই দিনটিতে শিক্ষক ও ছাত্রেরা একত্রিত হয়ে, শুরু করতেন ছত্রিশ সপ্তাহের ট্রিমেস্টার কোর্স। ওই সময় জৈনধর্মেও ‘চাতুর্মাস’, বা চার মাসের ধর্মনিষ্ঠার পর্ব শুরু হত। এখনও দুই ধর্মেই এই ঐতিহ্য বেশ কড়া ভাবেই পালন করা হয়।

জৈনরা বিশ্বাস করেন যে, এই দিনেই গান্ধারের গৌতম স্বামীকে, মহাবীর তাঁর প্রধান শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন ও দীক্ষা দেন। বুদ্ধও, তাঁর বোধিজ্ঞান লাভের এক মাস পর, এই আষাঢ়ের পূর্ণিমাতেই, সারনাথে গিয়ে তাঁর পাঁচ প্রাক্তন সঙ্গীকে প্রথম উপদেশ দিয়েছিলেন, যাকে বলে ধম্ম-চক্কপবত্তন সুত্ত। তার পরেই তিনি বর্ষার চার মাস কাটিয়েছিলেন মূলগন্ধ-কুটিতে, এই সময়টাই

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অনুসারীদের আত্মসংযমের সময়, যখন মাংস বা মাছ বা অন্যান্য কিছু খাবার থেকে নিজেদের বিরত রাখতে হয়।

সিংহলিরা এখনও এই বর্ষাবাস পালন করেন, তাঁদের ক্যালেন্ডারে যখন বর্ষা আসে সেই অনুযায়ী, আর তাইল্যান্ডের বৌদ্ধরা একে বলেন ফানসা এবং জুলাই থেকে অক্টোবর অবধি এটি বেশ অনুগত ভাবেই পালন করেন। ভিয়েতনাম, তিব্বত ও কোরিয়ায় বেশ কিছু বৌদ্ধ গোষ্ঠী এই সময়টিতে একটি জায়গা ছেড়ে অন্যত্র যান না, মায়ানমারেও অনেকেই বসসা পালন করেন।

এই দুটি সংগঠিত ধর্মের ভাল জিনিসগুলি আত্তীকরণ করতে হিন্দুধর্মের খুব দেরি হয়নি। এই দুই ধর্মেই বুদ্ধিজীবীরা কিছু দিন অন্তর একত্রিত হয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, মহাসম্মেলনে বা মঠে ধর্মের বিভিন্ন অংশ নিয়ে আলোচনা ও তর্ক করতেন। মনে রাখতে হবে, হিন্দু ধর্ম তার সংগঠিত রূপ ও সুস্পষ্ট চেহারা পাবে আরও হাজার বছরেরও পর, যখন শংকরাচার্য ও অন্যান্য মহান আচার্যেরা আবির্ভূত হবেন। যদিও ঋগ্বেদ বা বিভিন্ন উপনিষদে গুরু সম্পর্কে খুবই সশ্রদ্ধ উক্তি আছে, কিন্তু গুরুকে পূজা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট তারিখ আলাদা করে রাখার কোনও উদ্যোগ সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না।

অনেক পরে এসেছে ব্যাসমুনির গল্প বা ২১৬ শ্লোকে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য ‘গুরু গীতা’। আদি শঙ্করের উপদেশগুলিও, ইতিহাসবিদদের মতে, বুদ্ধ-মহাবীরের অন্তত দেড় সহস্রাব্দ পর রচিত। গুরুপূর্ণিমার গুণকীর্তন করা অন্যান্য রচনা, যেমন বরাহ পুরাণ, এসেছে আরও পরে, যদিও এটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে এই উৎসবটি সর্বজনীন ভাবে গৃহীত হয়ে গিয়েছিল খ্রিস্টধর্মের প্রচলনের আগেই।

আসল কথা, বর্ষাকালে মাঠ ঘাট জঙ্গল থাকত জলে আর সাপে আর পোকামাকড়ে ভর্তি। এটা বহু প্রাণীর যৌন মিলনের ঋতুও বটে। সমাজের অনুৎপাদক শ্রেণিকে এই সময়টায় মাঠঘাট থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে, তাঁদেরও লাভ, প্রাণীদেরও সুবিধে। সত্যি বলতে কী, এই যে প্রত্যেক বছরের জ্ঞান ও কৃৎকৌশলের পাঠ্যক্রমটা এই সময়েই শুরু হত, এতে সবচেয়ে লাভ হত হিন্দু ধর্মেরই, কারণ এই ধর্মে মধ্যযুগের শেষ সময়টা অবধি কোনও কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের আওতায় সংগঠিত শিক্ষাকেন্দ্র বা মঠ ছিল না।

শ্রাবণ, ভাদ্রপদ, আশ্বিন ও কার্তিক— এই চারটি মাসের পাঠ্যক্রম কখনও তিন মাসেও ছেঁটে আনা হত, বর্ষার মেয়াদ এবং ওই অঞ্চলের প্রয়োজন অনুযায়ী। আরও জরুরি ব্যাপার হল, গুরুদের তো টিকে থাকার জন্য আর্থিক অবলম্বন দরকার হত, এই সময়ে তাঁরা যে দান ও অর্ঘ পেতেন, তা খুবই কাজে লাগত। ভক্তি আন্দোলন— যা তুঙ্গে উঠেছিল চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে— হিন্দুধর্মকে জনগণের কাছে খুব প্রিয় করে তোলে এবং তার নেতৃত্ব দেন সব সম্প্রদায়ের গুরুরা। এতে গুরুপূর্ণিমা উৎসবটির প্রচলন আরও বেড়ে যায়।

গুরুকুল ব্যবস্থার একটা বিরাট অবদান হল, এর মাধ্যমে সঙ্গীত ও নৃত্যের এমন নিবিড় প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল, যা অন্য কোনও শিক্ষাব্যবস্থাই কোনও দিন ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। সোজা কথায়, এই ক্ষেত্রে কোনও একলব্যকে কোনও দিন ফিরিয়ে দেওয়া হত না। হাজার বছর ধরে, ভারতের সুফি সিলসিলাগুলি এই ধরনেরই সংগঠন চালিয়েছে, তবে এর চেয়েও বেশি সুসংবদ্ধ ভাবে, সেগুলির নাম খানকুয়াহ্, যেখানে মুরশিদ বা শেখ-রা প্রজন্মের পর প্রজন্ম মুরিদদের সংস্কৃতি ও ধর্মতত্ত্ব শিখিয়েছেন। কেন যে ভারতীয় উপমাহাদেশেই সবচেয়ে বেশি মুসলিম থাকেন, তা বোঝা যায়, এইগুলি খেয়াল রাখলে। এখন ‘উস্তাদ’ কথাটা সংগীতের ক্ষেত্রে সাধারণত হিন্দু ‘গুরু’রই মুসলিম সদৃশ-শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, এবং এই গুরু-শিষ্য পরম্পরা না থাকলে, বিংশ শতাব্দীতে যখন নবাব বা রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা উবে গেল, আর সংস্কৃতির গণতন্ত্রায়ন ঘটে গেল, তখন নাচ ও গানের অসামান্য চর্চা নিজেদের টিকিয়ে রাখতেই পারত না।

গুরুদের ব্যাপারে আর একটা জিনিস লক্ষ করার, ভারতীয় পুরাণ একেবারে ভর্তি সেই ধরনের গল্পে, যেখানে মুনিঋষিদের গুরুকুল আশ্রম বা তপোবনে বার বার রাক্ষস আর অসুরেরা আক্রমণ চালাত। এর ফলেই আর্যপুত্ররা তাদের হত্যা করতেন, আর নিজেদের ‘সভ্যতা’কে আরও প্রসারিত করতেন। এই অজুহাতে, আঞ্চলিক মানুষের ওপর বেশ চমৎকার সুপরিকল্পিত ভাবে আধিপত্য বিস্তার করা যেত, এবং তথাকথিত ‘আর্যত্ব’কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত। গুরু ও ঋষিরা যদি অজানা অঞ্চলে ঢুকে না পড়তেন, তা হলে ওই ভাবে বনভিত্তিক সংস্কৃতিকে উপড়ে, ‘সংস্কৃত’ ধরনের জীবনযাপন শতাব্দী ও সহস্রাব্দ জুড়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত না।

প্রসার ভারতীর সিইও। মতামত ব্যক্তিগত